রোগশয্যায়

রোগশয্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ... ... পৌষ, ১৩৪১

মূল্য—১৲ ও ৪৲

মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

বিশ্বের আরোগ্যলক্ষ্মী জীবনের অন্তঃপুরে যাঁর
পশুপক্ষী তরুতে লতায়
নিত্য রত অদৃশ্য শুশ্রূষা
জীর্ণতায় মৃত্যুপীড়িতেরে
অমৃতের সুধাস্পর্শ দিয়ে,
রোগের সৌভাগ্য নিয়ে তাঁর আবির্ভাব
দেখেছিনু যে-দুটি নারীর
স্নিগ্ধ নিরাময় রূপে
রেখে গেনু তাদের উদ্দেশে
অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা ॥

উদয়ন
১ ডিসেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

সূচীপত্র

রোগশয্যায়

১

সুরলোকে নৃত্যের উৎসবে
যদি ক্ষণকাল তরে
ক্লান্ত উর্বশীর
তালভঙ্গ হয়
দেবরাজ করে না মার্জনা।
পূর্বার্জিত কীর্তি তার
অভিসম্পাতের তলে হয় নির্বাসিত।
আকস্মিক ত্রুটি মাত্র স্বর্গ কভু করে না স্বীকার।
মানবের সভাঙ্গনে
সেখানেও আছে জেগে স্বর্গের বিচার।
তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে ;
কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপ-তালে।
খ্যাতিমুক্ত বাণী মোর
মহেন্দ্রের পদতলে করি' সমর্পণ
যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্ত মনে
বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া আলোয় ;
নির্মম ভবিষ্য জানি অতর্কিতে দস্যুবৃত্তি করে
কীর্তির সঞ্চয়ে,
আজি তার হয় হোক প্রথম সূচনা॥

উদয়ন
২৭ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

২

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান,
পদে পদে সংকটে সংকটে
নামহীন সমুদ্রের উদ্দেশবিহীন কোন্ তটে
পৌঁছিবারে অবিশ্রাম বাহিতেছে খেয়া,
কোন্ সে অলক্ষ্য পাড়ি-দেয়া
মর্মে বসি দিতেছে আদেশ,
নাহি তার শেষ।
চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী
এই শুধু জানি।
চলিতে চলিতে থামে, পণ্য তার দিয়ে যায় কা'কে,
পশ্চাতে যে রহে নিতে ক্ষণপরে সেও নাহি থাকে।
মৃত্যুর কবলে লুপ্ত নিরন্তর ফাঁকি,
তবু সে ফাঁকির নয়, ফুরাতে ফুরাতে রহে বাকি,
পদে পদে আপনারে শেষ করি দিয়া
পদে পদে তবু রহে জিয়া;
অস্তিত্বের মহৈশ্বর্য শতছিদ্র ঘটতলে ভরা,
অফুরান লাভ তার অফুরান ক্ষতিপথে ঝরা,
অবিশ্রাম অপচয়ে সঞ্চয়ের আলস্য ঘুচায়,
শক্তি তাহে পায়।
চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।
স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই-থাকা,
খোলা আর ঢাকা,
কী নামে ডাকিব তা'রে অস্তিত্বপ্রবাহে
মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে॥

৩

একা বসে আছি হেথায়
যাতায়াতের পথের তীরে।
যারা   বিহান বেলায় গানের খেয়া
আনল বেয়ে প্রাণের ঘাটে,
আলোছায়ার নিত্য নাটে
সাঁঝের বেলায় ছায়ায় তা'রা
মিলায় ধীরে।
আজকে তা'রা এল আমার
স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে,
সুরহারা সব ব্যথা যত
একতারা তা'র খুঁজে ফিরে।
প্রহর পরে প্রহর যে যায়
বসে বসে কেবল গণি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে॥

জোড়াসাঁকো
৩০ অক্টোবর, ১৯৪০

৪

অজস্র দিনের আলো
জানি একদিন
দু-চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি মহারাজ।
শোধ করে দিতে হবে জানি,
তবু কেন সন্ধ্যাদীপে
ফেলো ছায়াখানি।
রচিলে যে আলো দিয়ে তব বিশ্বতল
আমি সেথা অতিথি কেবল।
হেথা হোথা যদি পড়ে থাকে
কোনো ক্ষুদ্র ফাঁকে
নাই হোলো পুরা
সেটুকু টুকুরা—
রেখে যেয়ো ফেলে
অবহেলে,
যেথা তব রথ
শেষ চিহ্ন রেখে যায় অন্তিম ধুলায়
সেথায় রচিতে দাও আমার জগত।
অল্প কিছু আলো থাক্
অল্প কিছু ছায়া
আর কিছু মায়া।
ছায়াপথে লুপ্ত আলোকের পিছু
হয়তো কুড়ায়ে পাবে কিছু।
কণামাত্র লেশ
তোমার ঋণের অবশেষ॥

জোড়াসাঁকো
৩ নভেম্বর, ১৯৪০

৫

এই মহাবিশ্বতলে
যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলে,
চূর্ণ হোতে থাকে গ্রহতারা।
উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ যত
দিক্-বিদিকে অস্তিত্বের বেদনারে
প্রলয়দুঃখের রেণুজালে
ব্যাপ্ত করিবারে ছোটে প্রচণ্ড আবেগে।
পীড়নের যন্ত্রশালে
চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে
কোথা শেল শূল যত হতেছে ঝংকৃত,
কোথা ক্ষতরক্ত উৎসারিছে।
মানুষের ক্ষুদ্র দেহ,
যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।
সৃষ্টি ও প্রলয়-সভাতলে—
তার বহ্নিরসপাত্র
কী লাগিয়া যোগ দিল বিশ্বের ভৈরবীচক্রে
বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা—কেন
এ দেহের মৃৎভাণ্ড ভরিয়া
রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোতে করে বিপ্লাবিত।
প্রতিক্ষণে অন্তহীন মূল্য দিল তারে
মানবের দুর্জয় চেতনা,
দেহ-দুঃখ-হোমানলে
যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা কোথা আছে।
এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ,
এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা,

রোগশয্যায়

এমন উপেক্ষা মরণেরে,
হেন জয়যাত্রা—
বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে—
নামহীন জ্বালাময় কী তীর্থের লাগি
সাথে সাথে পথে পথে
এমন সেবার উৎস আগ্নেয় গহ্বর ভেদ করি'
অফুরান প্রেমের পাথেয় ॥

জোড়াসাঁকো
৪ নভেম্বর, ১৯৪০

৬

ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি,
একটুখানি আঁধার থাকতে বাকি
ঘুমঘোরের অল্প অবশেষে,
শাসির পরে ঠোকর মারো এসে,
দেখো কোনো খবর আছে নাকি।
তাহার পরে কেবল মিছিমিছি
যেমন খুশি নাচের সঙ্গে
যেমন খুশি কেবল কিচিমিচি ;
নির্ভীক ঐ পুচ্ছ
সকল বাধা শাসন করে তুচ্ছ।
যখন প্রাতে দোয়েলরা দেয় শিস
কবির কাছে পায় তারা বকশিশ,
সারা প্রহর একটানা এক পঞ্চম সুর সাধি
লুকিয়ে কোকিল করে কী ওস্তাদি,
সকল পাখি ঠেলে
কালিদাসের বাহবা সেই পেলে।
তুমি কেয়ার করো না তার কিছু,
মানো নাকো স্বরগ্রামের কোনো উঁচু নিচু।
কালিদাসের ঘরের মধ্যে ঢুকে
ছন্দভাঙা চেঁচামেচি
বাধাও কী কৌতুকে।
নবরত্ন-সভায় কবি যখন করে গান
তুমি তারি থামের মাথায় কী করো সন্ধান।
কবিপ্রিয়ার তুমি প্রতিবেশী,
সারা মুখর প্রহর ধ'রে তোমার মেশামেশি।
বসন্তেরি বায়না-করা
নয়তো তোমার নাট্য,

রোগশয্যায়

যেমন-তেমন নাচন তোমার,
নাইকো পারিপাট্য।
অরণ্যেরি গাহন-সভায় যাও না সেলাম ঠুকি',
আলোর সঙ্গে গ্রাম্য ভাষায় আলাপ মুখোমুখি ;
কী যে তাহার মানে
নাইকো অভিধানে,
স্পন্দিত ওই বক্ষটুকু তাহার অর্থ জানে।
ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে কী করো মস্করা,
অকারণে সমস্ত দিন কিসের এত ত্বরা।
মাটির পরে টান,
ধুলায় করো স্নান,
এমনি তোমার অযত্নেরি সজ্জা,
মলিনতা লাগে না তায় দেয় না তারে লজ্জা।
বাসা বাঁধো রাজার ঘরের ছাদের কোণে
লুকোচুরি নাইকো তোমার মনে।

অনিদ্রাতে যখন আমার কাটে দুখের রাত
আশা করি দ্বারে তোমার প্রথম চঞ্চুঘাত।
অভীক তোমার চটুল তোমার
সহজ প্রাণের বাণী
দাও আমারে আনি,
সকল জীবের দিনের আলো
আমারে লয় ডাকি,
ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি॥

জোড়াসাঁকো
১১ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

৭

গহন রজনীমাঝে
রোগীর আবিল দৃষ্টিতলে
যখন সহসা দেখি
তোমার জাগ্রত আবির্ভাব
মনে হয় যেন
আকাশে অগণ্য গ্রহতারা
অন্তহীন কালে
আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার।
তারপরে জানি যবে
তুমি চলে যাবে,
আতঙ্ক জাগায় অকস্মাৎ
উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা॥

জোড়াসাঁকো
১২ নভেম্বর, ১৯৪০
রাত্রি দুটা

৮

মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্ঝটিকা পানে
আলোকের কী যেন ভর্ৎসনা
দিগন্তের মূঢ়তারে তুলিছে তর্জনী।
পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে সূর্যোদয়
আকাশের ভালে,
লজ্জা ঘনীভূত হয়
হিমসিক্ত অরণ্যছায়ায়
স্তব্ধ হয় পাখিদের গান॥

জোড়াসাঁকো
১৩ নভেম্বর, ১৯৪০

১

হে প্রাচীন তমস্বিনী,
আজি আমি রোগের বিমিশ্র তমিস্রায়
মনে মনে হেরিতেছি
কালের প্রথম কল্পে নিরন্তর অন্ধকারে
বসেছ সৃষ্টির ধ্যানে
কী ভীষণ একা,
বোবা তুমি, অন্ধ তুমি।
অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস
তাই হেরিলাম আমি
অনাদি আকাশে।
পঙ্গু উঠিতেছে কাঁদি নিদ্রার অতল মাঝে,
আত্মপ্রকাশের ক্ষুধা বিগলিত লৌহগর্ভ হতে
গোপনে উঠিছে জ্বলি শিখায় শিখায়।
অচেতন তোমার অঙ্গুলি
অস্পষ্ট শিল্পের মায়া বুনিয়া চলিছে,
আদি মহার্ণব-গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে' ফুলে' উঠিতেছে—
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড
বিকলাঙ্গ অসম্পূর্ণ,
অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে
কালের দক্ষিণ হস্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ
বিরূপ কদর্য নেবে সুসংগত কলেবর
নব সূর্যালোকে।
মূর্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি'
ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা॥

জোড়াসাঁকো
১৩ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

১০

আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু
মিশাইলে মূলতানে,
গুঞ্জন তা'র র'বে চিরদিন
ভুলে যাবে তা'র মানে।
কর্মক্লান্ত পথিক যখন
বসিবে পথের ধারে,
এই রাগিণীর করুণ আভাস
পরশ করিবে তা'রে ;
নীরবে শুনিবে মাথাটি করিয়া নিচু,
শুধু এইটুকু আভাসে বুঝিবে
বুঝিবে না আর কিছু—
বিস্মৃত যুগে দুর্লভ ক্ষণে
বেঁচেছিল কেউ বুঝি
আমরা যাহার খোঁজ পাই নাই
তাই সে পেয়েছে খুঁজি॥

জোড়াসাঁকো
১৩ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

১১

জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা
সুতীব্র অক্ষমা।
অগোচরে কোনোখানে একটি রেখার হোলে ভুল
দীর্ঘকালে অকস্মাৎ আপনারে করে সে নির্মূল।
ভিত্তি যার ধ্রুব ব'লে হয়েছিল মনে
তলে তার ভূমিকম্প ট'লে ওঠে প্রলয়নর্তনে।
প্রাণী কত এসেছিল দলে দলে
জীবনের রঙ্গভূমে
অপর্যাপ্ত শক্তির সম্বলে
সে শক্তিই ভ্রম তার,
ক্রমেই অসহ্য হয়ে লুপ্ত ক'রে দেয় মহা ভার।
কেহ নাহি জানে
এ বিশ্বের কোন্‌খানে
প্রতিক্ষণে জমা
দারুণ অক্ষমা।
দৃষ্টির অতীত ত্রুটি করিয়া ভেদন
সম্বন্ধের দৃঢ় সূত্র করিছে ছেদন,
ইঙ্গিতের স্ফুলিঙ্গের ভ্রম
পশ্চাতে ফেরার পথ চিরতরে করিছে দুর্গম।
দারুণ ভাঙন এ যে পূর্ণেরি আদেশে
কী অপূর্ব সৃষ্টি তার দেখা দিবে শেষে,

রোগশয্যায়

গুঁড়াবে অবাধ্য মাটি বাধা হবে দূর,
বহিয়া নূতন প্রাণ উঠিবে অঙ্কুর।
হে অক্ষমা,
সৃষ্টির বিধানে তুমি শক্তি যে পরমা,
শান্তির পথের কাঁটা তব পদপাতে
বিদলিত হয়ে যায় বারবার আঘাতে আঘাতে॥

জোড়াসাঁকো
১৩ নভেম্বর, ১৯৪০

১২

সকাল বেলায় উঠেই দেখি চেয়ে
যাহা তাহা রয়েছে ঘর ছেয়ে,
খাতাপত্র কোথায় রাখি কী যে
হাৎড়ে বেড়াই খুঁজে না পাই নিজে।
দামী যত কোথায় কী হয় জমা,
ছড়াছড়ি, নাই কোনো তার সেমিকোলন কমা।
পড়ে আছে পত্রবিহীন লেফাফা সব ছিন্ন,
এইতো দেখি পুরুষ জাতের জাত-কুঁড়েমির চিহ্ন।
পরক্ষণেই নামে কাজে মেয়ের হস্ত দুটি
মুহূর্তেকেই বিলুপ্ত হয় যেথায় যত ত্রুটি।
দ্রুত হস্তে নিলজ্জ সব বিশৃঙ্খলার প্রতি
নিয়ে আসে শোভনা তার চরম সদ্গতি।
ছেঁড়ার ক্ষত আরোগ্য হয় দাগীর লজ্জা ঢাকে,
অদরকারীর গোপন বাসা কোথাও নাহি থাকে।
অগোছালোর মধ্যে থাকি ভাবি অবাক-পারা
সৃষ্টিতে এই পুরুষ মেয়ের চলেছে দুইধারা,—
পুরুষ আপন চারিদিকে জমায় আবর্জনা
মেয়ে এসে নিত্য তা'রে করিছে মার্জনা॥

জোড়াসাঁকো
১৪ নভেম্বর, ১৯৪০
দুপুর

১৩

দীর্ঘ দুঃখরাত্রি যদি
এক অতীতের প্রান্ততটে
খেয়া তার শেষ করে থাকে
তবে নব বিস্ময়ের মাঝে
বিশ্বজগতের শিশুলোকে
জেগে ওঠে যেন সেই নূতন প্রভাতে
জীবনের নূতন জিজ্ঞাসা।
পুরাতন প্রশ্নগুলি উত্তর না পেয়ে
অবাক বুদ্ধিরে যারা সদা ব্যঙ্গ করে
বালকের চিন্তাহীন লীলাচ্ছলে
সহজ উত্তর তার পাই যেন মনে
সহজ বিশ্বাসে,
যে বিশ্বাস আপনার মাঝে তৃপ্ত থাকে
করে না বিরোধ,
আনন্দের স্পর্শ দিয়ে সত্যের প্রত্যয় দেয় এনে॥

জোড়াসাঁকো
১৫ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

১৪

নদীর একটা কোণে শুষ্ক মরা ডাল
স্রোতের ব্যাঘাত যদি করে
সৃষ্টিশক্তি ভাসমান আবর্জনা নিয়ে
সেখানে প্রকাশ করে আপনার রচনাচাতুরী,
ছোটো দ্বীপ গড়ে তোলে টেনে আনে শৈবালের দল
তীরের যা পরিত্যক্ত নেয় সে কুড়ায়ে
দ্বীপসৃষ্টি-উপাদানে যাহা তাহা জোটায় সম্বল।
আমার রোগীর ঘরে আবদ্ধ আকাশে
তেমনি চলেছে সৃষ্টি
চৌদিকের সব হতে স্বতন্ত্র স্বরূপে।
তাহার কর্মের আবর্তন
ছোটো সীমাটিতে।
কপালেতে হাত দিয়ে দেখে
তাপ আছে কিনা,
উদ্বিগ্ন চক্ষুর দৃষ্টি প্রশ্ন করে, ঘুম নেই কেন।
চুপি চুপি পা টিপিয়া
ঘরে আনে প্রভাতের আলো।
পথ্যের থালাটি নিয়ে হাতে
বার বার উপরোধে
রুচির বিরোধ লয় জিনি'।
এলোমেলো যত কিছু সযত্নে গুছায়ে রাখে
আঁচলে ধুলার লেশ ঝাড়ি'।
দু'হাতে সমান করি' শয্যার কুঞ্চন
আসন প্রস্তুত রাখে শিয়রের কাছে
বিনিদ্র সেবার লাগি।
কথা হেথা ধীর স্বরে,
দৃষ্টি হেথা বাষ্প দিয়ে ছোঁওয়া,

রোগশয্যায়

স্পর্শ হেথা কম্পিত করুণ,
জীবনের এই রুদ্ধ স্রোত
আপনার কেন্দ্রে আবর্তিত
বাহিরের সংবাদের
ধারা হতে বিচ্ছিন্ন সুদূর।

একদিন বন্যা নামে শৈবালের দ্বীপ যায় ভেসে ;
পূর্ণ জীবনের যবে নামিবে জোয়ার
সেই মতো ভেসে যাবে সেবার বাসাটি
সেথাকার দুঃখপাত্রে সুধাভরা এই ক'টা দিন ॥

উদয়ন
শান্তিনিকেতন
১৯ নভেম্বর, ১৯৪০

১৫

অসুস্থ শরীরখানা
কোন্ অবরুদ্ধ ভাষা করিছে বহন,
বাণীর ক্ষীণতা
মুহ্যমান আলোকেতে রচিতেছে অস্পষ্টের কারা।
নির্ঝর যখন ছোটে পরিপূর্ণ বেগে
বহুদূর দুর্গমেরে করিবারে জয়
গর্জন তাহার
অস্বীকার করি' চলে গুহার সংকীর্ণ আত্মীয়তা,
ঘোষণা করিতে থাকে নিখিল বিশ্বের অধিকার।
বলহারা ধারা তার মৃদু হয় যবে
বৈশাখের শীর্ণ শুষ্কতায়
হারায় আপন মন্দ্রধ্বনি,
কৃশতম হয়ে আসে আপনার কাছে
আপনার পরিচয়।
খণ্ড খণ্ড কুণ্ড মাঝে
ক্লান্ত তার গতিস্রোত লীন হয়ে থাকে।
তেমনি আমার রুগ্ন বাণী
স্পর্ধা হারায়েছে তার
শক্তি নাই জীবনের সঞ্চিত গ্লানিরে
ধিক্কার দিবার।
আত্মগত ক্লিষ্ট জীবনের কুহেলিকা
তাহার বিশ্বের দৃষ্টি করিছে হরণ।

রোগশয্যায়

হে প্রভাতসূর্য
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল,
প্রভাতধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত,
দুর্বল প্রাণের দৈন্য
হিরণ্ময় ঐশ্বর্যে তোমার
দূর করি' দাও
পরাভূত রজনীর অপমানসহ ॥

উদয়ন
২১ নভেম্বর, ১৯৪০

১৬

অবসন্ন আলোকের
শরতের সায়াহ্ন প্রতিমা,
সংখ্যাহীন তারকার শান্ত নীরবতা
স্তব্ধ তার হৃদয়গহনে,
প্রতিক্ষণে নিঃশ্বসিত নিঃশব্দ শুশ্রূষা।
আঁধারের গুহা দিয়ে
আসে তার জাগরণ-পথে
হতাশ্বাস রজনীর মন্থর প্রহরগুলি
প্রভাতের শুকতারা পানে
পূজাগন্ধী বাতাসের
হিমস্পর্শ লয়ে।
সায়াহ্নের ম্লানদীপ্তি
সে করুণচ্ছবি
ধরিল কল্যাণরূপ
আজি প্রাতে অরুণকিরণে,
দেখিলাম ধীরে আসে আশীর্বাদ বহি'
শেফালি-কুসুমরুচি আলোর থালায়॥

১৭

কখন ঘুমিয়েছিনু
জেগে উঠে দেখিলাম
কমলালেবুর ঝুড়ি
পায়ের কাছেতে
কে গিয়েছে রেখে।
কল্পনায় ডানা মেলে
অনুমান ঘুরে ঘুরে ফিরে
একে একে নানা স্নিগ্ধ নামে।
স্পষ্ট জানি নাই জানি
এক অজানারে লয়ে
নানা নাম মিলিল আসিয়া
নানা দিক হতে।
এক নামে সব নাম সত্য হয়ে উঠি'
দানের ঘটায়ে দিল
পূর্ণ সার্থকতা॥

উদয়ন
২১ নভেম্বর, ১৯৪০

১৮

সংসারের নানাক্ষেত্রে নানাকর্মে বিক্ষিপ্ত চেতনা
মানুষকে দেখি সেথা বিচিত্রের মাঝে
পরিব্যাপ্ত রূপে ;
কিছু তার অসমাপ্ত, অপূর্ণ কিছু বা।
রোগীকক্ষে নিবিড় একান্ত পরিচয়
একাগ্র লক্ষ্যের চারিদিকে,
নূতন বিস্ময় সে যে
দেখা দেয় অপরূপ রূপে।
সমস্ত বিশ্বের দয়া
সম্পূর্ণ সংহৃত তার মাঝে
তার করস্পর্শে, তার বিনিদ্র ব্যাকুল আঁখিপাতে

উদয়ন
২৩ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

১৯

সজীব খেলনা যদি
গড়া হয় বিধাতার কর্মশালে,
কী তাহার দশা হয়
তাই করি অনুভব
আজি আয়ুশেষে।
হেথা খ্যাতি মোর পরাহত,
উপেক্ষিত গাম্ভীর্য আমার,
নিষেধে অনুশাসনে
শোওয়া বসা চলে।
"চুপ করে থাকো",
"বেশি কথা কওয়া ভালো নয়",
"আরো কিছু খেতে হবে",
এ সকল আদেশ নির্দেশ
কভু ভর্ৎসনায় কভু অনুনয়ে
যাহাদের কণ্ঠ হতে আসে
তাহাদের পরিত্যক্ত খেলাঘরে
ভাঙা পুতুলের ট্রাজেডিতে
এই তো সেদিন মাত্র পড়েছে কৈশোর-যবনিকা।
কিছুক্ষণ
বিরোধের স্পর্ধা করি,
তারপরে ভালোছেলে হয়ে
যেমন চালায় তাই চলি।
মনে ভাবি
বৃদ্ধ ভাগ্য তার শাসনের ভার

রোগশয্যায়

কিছুদিন নূতন ভাগ্যের হাতে
সঁপি দিয়া কটাক্ষে হাসিছে দূরে থেকে,
হেসেছিল যেমন বাদশা
আবুহোসেনের পালা
রচিয়া আড়ালে।
অমোঘ বিধির রাজ্যে বারবার হয়েছি বিদ্রোহী,
এ রাজ্যে নিয়েছি মেনে
সেই দণ্ড
যাহা মৃণালের চেয়ে সুকোমল,
বিদ্যুতের চেয়ে স্পষ্ট
তর্জনী যাহার॥

উদয়ন
২৩ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

২০

রোগদুঃখ রজনীর নীরন্ধ্র আঁধারে
যে আলোকবিন্দুটিরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি
মনে ভাবি কী তার নির্দেশ।
পথের পথিক যথা জানালার রন্ধ্র দিয়ে
উৎসব-আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস,
সেই মতো যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশপারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে,
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি,
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে॥

উদয়ন
২৪ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

২১

সকালে জাগিয়া উঠি'
ফুলদানে দেখিনু গোলাপ,
প্রশ্ন এল মনে
যুগ-যুগান্তের আবর্তনে
সৌন্দর্যের পরিণামে যে শক্তি তোমারে আনিয়াছে
অপূর্ণের কুৎসিতের প্রতি পদে পীড়ন এড়ায়ে
সে কি অন্ধ সে কি অন্যমনা,
সেও কি বৈরাগ্যব্রতী সন্ন্যাসীর মতো
সুন্দরে ও অসুন্দরে ভেদ নাহি করে,
শুধু জ্ঞানক্রিয়া শুধু বলক্রিয়া তার
বোধের নাইকো কোনো কাজ ?
কা'রা তর্ক ক'রে বলে,— সৃষ্টির সভায়
সুশ্রী কুশ্রী বসে আছে সমান আসনে,
প্রহরীর কোনো বাধা নাই।
আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে,
লক্ষ কোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন,
ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ ॥

উদয়ন
২৪ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

২২

মধ্যদিনে আধো ঘুমে আধো জাগরণে
বোধ করি স্বপ্নে দেখেছিনু
আমার সত্তার আবরণ
খসে পড়ে গেল
অজানা নদীর স্রোতে
লয়ে মোর নাম মোর খ্যাতি
কৃপণের সঞ্চয় যা কিছু
লয়ে কলঙ্কের স্মৃতি
মধুর ক্ষণের স্বাক্ষরিত,
গৌরব ও অগৌরব
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যায়
তারে আর পারি না ফিরাতে ;
মনে মনে তর্ক করি আমিশূন্য আমি,
যা কিছু হারাল মোর
সব চেয়ে কার লাগি বাজিল বেদনা।
সে মোর অতীত নহে
যারে লয়ে সুখে দুঃখে কেটেছে আমার রাত্রিদিন।
সে আমার ভবিষ্যৎ
যারে কোনোকালে পাই নাই,
যার মধ্যে আকাঙ্খা আমার
ভূমিগর্ভে বীজের মতন
অঙ্কুরিত আশা লয়ে
দীর্ঘরাত্রি স্বপ্ন দেখেছিল
অনাগত আলোকের লাগি॥

উদয়ন
২৪ নভেম্বর, ১৯৪০
বিকাল

২৩

আরোগ্যের পথে
যখন পেলেম সখ্য
প্রসন্ন প্রাণের নিমন্ত্রণ
দান সে করিল মোরে
নূতন চোখের বিশ্ব-দেখা।
প্রভাত-আলোয় মগ্ন ঐ নীলাকাশ
পুরাতন তপস্বীর
ধ্যানের আসন,
কল্প-আরম্ভের
অন্তহীন প্রথম মুহূর্তখানি
প্রকাশ করিল মোর কাছে ;
বুঝিলাম এই এক জন্ম মোর
নব নব জন্মসূত্রে গাঁথা।
সপ্তরশ্মি সূর্যালোক সম
এক দৃশ্য বহিতেছে
অদৃশ্য অনেক সৃষ্টিধারা॥

উদয়ন
২৫ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

২৪

প্রত্যুষে দেখিনু আজ নির্মল আলোকে
নিখিলের শান্তি-অভিষেক,
তরুগুলি নম্রশিরে ধরণীর নমস্কার করিল প্রচার।
যে শান্তি বিশ্বের মর্মে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত
রক্ষা করিয়াছে তা'রে
যুগ যুগান্তের যত আঘাতে সংঘাতে।
বিক্ষুব্ধ এ মর্ত্যভূমে
নিজের জানায় আবির্ভাব
দিবসের আরম্ভে ও শেষে।
তারি পত্র পেয়েছ তো কবি মাঙ্গলিক।
সে যদি অমান্য করে বিদ্রূপের বাহক সাজিয়া
বিকৃতির সভাসদরূপে
চিরনৈরাশ্যের দূত,
ভাঙা যন্ত্রে বেসুর ঝংকারে
ব্যঙ্গ করে এ বিশ্বের শাশ্বত সত্যেরে
তবে তার কোন্ আবশ্যক।
শস্যক্ষেত্রে কাঁটাগাছ এসে
অপমান করে কেন মানুষের অন্নের ক্ষুধারে।
রুগ্ন যদি রোগেরে চরম সত্য বলে,
তাহা নিয়ে স্পর্ধা করা লজ্জা ব'লে জানি
তার চেয়ে বিনা বাক্যে আত্মহত্যা ভালো।

মানুষের কবিত্বই
হবে শেষে কলঙ্কভাজন
অসংস্কৃত যদৃচ্ছের পথে চলি'।
মুখশ্রীর করিবে কি প্রতিবাদ
মুখোষের নির্লজ্জ নকলে ॥

উদয়ন
২৬ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

২৫

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল
—আনন্দঅমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।—
ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানেরে খর্ব করা সহজ পটুতা।
অন্তহীন দেশ কালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ডরূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক॥

উদয়ন
২৮ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

২৬

আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস।
জানি কালসিন্ধু তা'রে
নিয়ত তরঙ্গঘাতে
দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।
আমার বিশ্বাস আপনারে।
দুই বেলা সেই পাত্র ভরি'
এ বিশ্বের নিত্য সুধা
করিয়াছি পান।
প্রতি মুহূর্তের ভালোবাসা
তার মাঝে হয়েছে সঞ্চিত।
দুঃখভারে দীর্ণ করে নাই
কালো করে নাই ধূলি
শিল্পেরে তাহার।
আমি জানি যাব যবে
সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি'
সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে
এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি।
এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার॥

উদয়ন
২৮ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

২৭

খুলে দাও দ্বার,
নীলাকাশ করো অবারিত,
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ,
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়,
আমি বেঁচে আছি তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও ;
এ প্রভাত
আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে দিক্ মোর মন
যেমন সে ঢেকে দেয় নবশষ্প শ্যামল প্রান্তর।
ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা
শুনি এই আকাশে বাতাসে
তারি পুণ্যঅভিষেকে করি আজ স্নান।
সমস্ত জন্মের সত্য একখানি রত্নহার রূপে
দেখি ঐ নীলিমার বুকে ॥

উদয়ন
২৮ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

২৮

যে চৈতন্যজ্যোতি
প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তরগগনে
নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়
আদি যার শূন্যময় অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক,
মাঝখানে কিছুক্ষণ
যাহা কিছু আছে তার অর্থ যাহা করে উদ্ভাসিত।
এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃত রূপে,
আজি প্রভাতের জাগরণে
এ বাণী উঠিল বাজি' মর্মে মর্মে মোর,
এ বাণী গাঁথিয়া চলে সূর্য গ্রহতারা
অস্খলিত ছন্দসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে॥

উদয়ন
২৯ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

২৯

দুঃসহ দুঃখের বেড়াজালে
মানবেরে দেখি যবে নিরুপায়
ভাবিয়া না পাই মনে
সান্ত্বনা কোথায় আছে তার।
আপনারি মূঢ়তায় আপনারি রিপুর প্রশ্রয়ে
এ দুঃখের মূল জানি,
সে জানায় আশ্বাস না পাই।
এ কথা যখন জানি
মানব-চিত্তের সাধনায়
গূঢ় আছে যে সত্যের রূপ
সেই সত্য সুখ দুঃখ সবের অতীত,
তখন বুঝিতে পারি
আপন আত্মায় যারা
ফলবান করে তা'রে
তা'রাই চরম লক্ষ্য মানবসৃষ্টির ;
একমাত্র তা'রা আছে আর কেহ নাই ;
আর যারা সবে
মায়ার প্রবাহে তা'রা ছায়ার মতন,
দুঃখ তাহাদের সত্য নহে
সুখ তাহাদের বিড়ম্বনা,
তাহাদের ক্ষতব্যথা দারুণ আকৃতি ধ'রে
প্রতিক্ষণে লুপ্ত হয়ে যায়
ইতিহাসে চিহ্ন নাহি রাখে॥

উদয়ন
২৯ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

৩০

সৃষ্টির চলেছে খেলা
চারিদিক হতে শতধারে
কালের অসীম শূন্য পূর্ণ করিবারে
সম্মুখে যা কিছু ঢালে পিছনে তলায় বারে বারে,
নিরন্তর লাভ আর ক্ষতি
তাহাতেই দেয় তা'রে গতি।
কবির ছন্দের খেলা সেও থাকি' থাকি'
নিশ্চিহ্ন কালের গায়ে ছবি আঁকাআঁকি।
কাল যায় শূন্য থাকে বাকি।
এই আঁকা-মোছা নিয়ে কাব্যের সচল মরীচিকা
ছেড়ে দেয় স্থান,
পরিবর্তমান
জীবন-যাত্রার করে চলমান টীকা।
মানুষ আপন-আঁকা কালের সীমায়
সান্ত্বনা রচনা করে অসীমের মিথ্যা মহিমায়,
ভুলে যায় কত-না যুগের বাণীরূপ
ভূমিগর্ভে বহিতেছে নিঃশব্দের নিষ্ঠুর বিদ্রূপ॥

উদয়ন
৩০ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

৩১

আজিকার অরণ্যসভারে
অপবাদ দাও বারে বারে ;
বলো যবে দৃঢ় কণ্ঠে অহংকৃত আপ্তবাক্যবৎ
প্রকৃতির অভিপ্রায়,—নব ভবিষ্যৎ
করিবে বিরল রসে শুষ্ক তার গান,—
বনলক্ষ্মী করিবে না অভিমান।
এ কথা সবাই জানে
যে সংগীতরসপানে
প্রভাতে প্রভাতে
আনন্দে আলোকসভা মাতে
সে যে হেয়
সে যে অশ্রদ্ধেয়
প্রমাণ করিতে তাহা আরো বহু দীর্ঘকাল যাবে
এই একভাবে।
বনের পাখিরা ততদিন
সংশয়বিহীন
চিরন্তন বসন্তের স্তবে
আকাশ করিবে পূর্ণ
আপনার আনন্দিত রবে॥

উদয়ন
৩০ নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

৩২

প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রসন্ন পরশে
অস্তিত্বের স্বর্গীয় সম্মান,
জ্যোতিস্রোতে মিশে যায় রক্তের প্রবাহ,
নীরবে ধ্বনিত হয় দেহে মনে জ্যোতিষ্কের বাণী।
রহি আমি দু' চক্ষুর অঞ্জলি পাতিয়া
প্রতিদিন ঊর্ধ্বপানে চেয়ে।
এ আলো দিয়েছে মোরে জন্মের প্রথম অভ্যর্থনা
অস্তসমুদ্রের তীরে এ আলোর দ্বারে
র'বে মোর জীবনের শেষ নিবেদন।
মনে হয় বৃথা বাক্য বলি, সব কথা বলা হয় নাই,
আকাশ-বাণীর সাথে প্রাণের বাণীর
সুর বাঁধা হয় নাই পূর্ণ সুরে,
ভাষা পাই নাই॥

উদয়ন
১ ডিসেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

৩৩

বহুকাল আগে তুমি দিয়েছিলে একগুচ্ছ ধূপ,
আজি তার ধোঁয়া হতে বাহিরিল অপরূপ রূপ ;
যেন কোন্ পুরাণী আখ্যানে
স্তব্ধ মোর ধ্যানে
ধীরপদে এল কোন্ মালবিকা
লয়ে দীপশিখা
মহাকাল-মন্দিরের দ্বারে
যুগান্তের কোন্ পারে।
সদ্য স্নান পরে
সিক্ত বেণী গ্রীবা তার জড়াইয়া ধরে,
চন্দনের মৃদুগন্ধ আসে
অঙ্গের বাতাসে।
মনে হয় এই পূজারিণী
এরে আমি বারবার চিনি,
আসে মৃদুমন্দ পদে
চিরদিবসের বেদীতলে
তুলি' ফুল শুচিশুভ্র বসন-অঞ্চলে।
শান্ত স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টিতে
সেই বাণী নিয়ে আসে এ যুগের ভাষার সৃষ্টিতে।
সুললিত বাহুর কঙ্কণে
প্রিয়জন-কল্যাণের কামনা বহিছে সযতনে,

রোগশয্যায়

প্রীতি আত্মহারা
আদি সূর্যোদয় হতে
বহি আনে আলোকের ধারা।
দূর কাল হতে তারি
হস্ত দুটি লয়ে সেবা-রস
আতপ্ত ললাট মোর আজো ধীরে করিছে পরশ॥

উদয়ন
২ ডিসেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

৩৪

যখন বীণায় মোর আনমনা সুরে
গান বেঁধেছিনু বসি একা
তখনো যে ছিলে তুমি দূরে
দাও নাই দেখা ;
কেমনে জানিব সেই গান
অপরিচয়ের তীরে তোমারেই করিছে সন্ধান।
দেখিলাম কাছে তুমি আসিলে যেমনি
তোমারি গতির তালে বাজে মোর এ ছন্দের ধ্বনি
মনে হোলো সুরের সে মিলে
উচ্ছ্বসিল আনন্দের নিশ্বাস নিখিলে।
বর্ষে বর্ষে পুষ্পবনে পুষ্পগুলি ফুটে আর ঝরে
এ মিলের তরে।
কবির সংগীতে বাণী অঞ্জলি পাতিয়া আছে জাগি
অনাগত প্রসাদের লাগি।
চলে লুকাচুরি খেলা বিশ্বে অনিবার
অজানার সাথে অজানার।

উদয়ন
২ ডিসেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

৩৫

যেমন ঝড়ের পরে
আকাশের বক্ষতল করে অবারিত
উদয়াচলের জ্যোতিঃপথ
গভীর নিস্তব্ধ নীলিমায়,
তেমনি জীবন মোর মুক্ত হোক
অতীতের বাষ্পজাল হতে,
সদ্য নব জাগরণ দিক্ শঙ্খধ্বনি
এ জন্মের নব জন্মদ্বারে।
প্রতীক্ষা করিয়া আছি
আলো হতে মুছে যাক রঙের প্রলেপ,
ঘুচে যাক ব্যর্থ খেলা আপনারে খেলেনা করিয়া,
নিরাসক্ত ভালোবাসা আপন দাক্ষিণ্য হতে
শেষ মূল্য পায় যেন তার।
আয়ুস্রোতে ভাসি যবে আঁধারে আলোতে
তীরে তীরে অতীত কীর্তির পানে
ফিরে ফিরে না যেন তাকাই;
সুখে দুঃখে নিরন্তর
লিপ্ত হয়ে আছে যে আপনা
আপন-বাহিরে তা'রে স্থাপন করিতে যেন পারি
সংসারের শতলক্ষ ভাসমান ঘটনার সমান শ্রেণীতে,
নিঃশঙ্ক নিস্পৃহ চোখে দেখি যেন তারে
অনাত্মীয় নির্বাসনে,
এই শেষ কথা মোর
সম্পূর্ণ করুক মোর পরিচয় অসীম শুভ্রতা॥

উদয়ন
৩ ডিসেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

৩৬

যাহা কিছু চেয়েছিনু একান্ত আগ্রহে
তাহার চৌদিক হতে বাহুর বেষ্টন
অপসৃত হয় যবে
তখন সে বন্ধনের মুক্তক্ষেত্রে
যে চেতনা উদ্ভাসিয়া উঠে
প্রভাত-আলোর সাথে
দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ।
শূন্য তবু সে তো শূন্য নয়।
তখন বুঝিতে পারি ঋষির সে বাণী—
আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহমন হইত নিশ্চল।
কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ॥

উদয়ন
৩ ডিসেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

৩৭

ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্ত সূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা,
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ,
দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে॥

উদয়ন
৪ ডিসেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

৩৮

ধর্মরাজ দিল যবে ধ্বংসের আদেশ
আপন হত্যার ভার আপনিই নিল মানুষেরা
ভেবেছি পীড়িত মনে পথভ্রষ্ট পথিক গ্রহের
অকস্মাৎ অপঘাতে একটি বিপুল চিতানলে
আগুন জ্বলে না কেন মহা এক সহমরণের।
তারপরে ভাবি মনে
দুঃখে দুঃখে পাপ যদি নাহি পায় ক্ষয়
প্রলয়ের ভস্মক্ষেত্রে বীজ তার র'বে সুপ্ত হয়ে,
নূতন সৃষ্টির বক্ষে
কণ্টকিয়া উঠিবে আবার॥

উদয়ন
৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

৩৯

তোমারে দেখি না যবে মনে হয় আর্ত কল্পনায়
পৃথিবী পায়ের নিচে চুপি চুপি করিছে মন্ত্রণা
সরে যাবে ব'লে।
আঁকড়ি' ধরিতে চাহি উৎকণ্ঠায় শূন্য আকাশেরে
দুই বাহু তুলি'।
চমকিয়া স্বপ্ন যায় ভেঙে
দেখি তুমি নতশিরে বুনিছ পশম
বসি' মোর পাশে
সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি'॥

উদয়ন
৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে